আসে। এই ভিন্নতা অতীতের মতো

রাজনীতি (Politics)

ভূমিকা (Introduction)

নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটিকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science) নামে অভিহিত করা সমীচীন কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। তাই **জেলিনেক** (Jellinek) মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো এমন একটিও বিজ্ঞান নেই, যার একটি সুন্দর পরিভাষা (a good terminology) একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার ফলে আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রটিকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, যেমন, 'রাষ্ট্রনীতি' বা 'রাজনীতি' (Politics), 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science), 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (Political Theory) ইত্যাদি। **অ্যারিস্টট্‌ল, সিজউইক** (Sidgwick), **জেলিনেক, লাওয়েল** (Lowell), **লিপসন** (Lipson), **ল্যাস্কি** (Laski), **অ্যালান বল** (Alan Ball) প্রমুখ চিন্তাবিদ 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানে'র পরিবর্তে 'রাষ্ট্রনীতি' বা 'রাজনীতি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু **ব্রাইস** (Bryce), **সিলী** (Seely), **বার্জেস** (Burgess) প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতির সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য নির্দেশ ক'রে শেষোক্ত নামটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

উৎপত্তি (Origin)

প্রাচীন গ্রিসে 'রাজনীতি' শব্দটির উৎপত্তি

গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টট্‌লের** কালজয়ী গ্রন্থটির নাম *পলিটিক্‌স* (*Politics*)। গ্রিক শব্দ *পোলিস্ (polis)* থেকে ইংরেজি 'পলিটিক্‌স' শব্দটি এসেছে। *পোলিস্* শব্দের অর্থ 'নগর' ('city')। তৎকালীন গ্রিক নগররাষ্ট্রসমূহ (city states) এবং তাদের অনুসৃত নীতি ও সমস্যাদি-সংক্রান্ত আলোচনাকে **অ্যারিস্টট্‌ল** 'রাজনীতি'র বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আকৃতি, প্রকৃতি, কার্যাবলি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া, বর্তমানে মানুষের **রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত জটিল ও সমস্যাসংকুল**। প্রাচীন গ্রিক পদ্ধতিতে এইসব সমস্যার সমাধান করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই 'রাজনীতি' বলতে **অ্যারিস্টট্‌ল** যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, বর্তমানে সেই অর্থে 'রাজনীতি' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না।

অর্থ (Meaning)

...বিশ্লেষণ করাই হল রাজনীতির কাজ।

অ্যালান বল, ইস্টন প্রমুখের অভিমত

অ্যালান বল (Alan Ball) তাঁর *মডার্ন পলিটিক্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট (Modern Politics and Government)* নামক পুস্তকে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'রাজনীতি' হল 'একটি কার্যকলাপ' ('an activity'), 'কোনো নৈতিক নির্দেশ নয়' ('not a moral prescription')। তাঁর মতে, **রাজনৈতিক কার্যকলাপ সমাজের সর্বস্তরে বিরোধ ও বিরোধ নিষ্পত্তি** (conflict and conflict resolution)-**র সঙ্গে যুক্ত** থাকে। সমাজের সর্বস্তরেই রাজনীতির অবস্থিতি লক্ষ করা যায় বলে তিনি এটিকে '**একটি সর্বজনীন কার্যকলাপ**' ('a universal activity') বলে চিহ্নিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি **একটি পুতুল নিয়ে দুটি শিশুর মধ্যে বিরোধের** কথা বলেছেন। দুটি শিশু একই সময়ে পুতুলটি পেতে আগ্রহী হলে কে পুতুলটি পাবে, তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ বাধতে পারে। এমতাবস্থায় তুলনামূলকভাবে বলবান শিশুটি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অপর শিশুটির কাছ থেকে পুতুলটি কেড়ে নিতে পারে কিংবা মা এসে তাঁর অধিকতর

শক্তিশালী পদমর্যাদা প্রয়োগ ক'রে তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। এইভাবে সমাজের **সর্বস্তরে পরস্পর-বিরোধী লক্ষ্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকেই বিরোধের উৎপত্তি** ঘটে এবং হিংসা বা বলপ্রয়োগ, আলাপ-আলোচনা, দরকষাকষি, ভোটাভুটি প্রভৃতির মতো **বিভিন্ন উপায় অনুসরণের মাধ্যমে** সেইসব বিরোধের **নিষ্পত্তি** করা হয়। **ডেভিড ইস্টন** (David Easton) রাজনীতি বলতে **'মূল্যের কর্তৃত্বমূলক বণ্টন'** ('authoritative allocation of values')-কে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, 'মূল্য' হল মানুষের অভীষ্ট সেইসব মূল্যবান জিনিস, যেগুলির প্রাপ্তি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। আবার, 'কর্তৃত্বমূলক বণ্টন' বলতে **ইস্টন** ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেইসব ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে বোঝাতে চেয়েছেন, যাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে, **আর্ল লাথাম** (Earl Latham) তাঁর *দ্য গ্রুপ বেসিস্ অব্ পলিটিক্স (The Group Basis of Politics)* নামক গ্রন্থে **রাজনীতিকে ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ** করেছেন। তাঁর মতে, রাজনীতি হল সমাজের এমন একটি 'প্রক্রিয়া' ('process'), যা ক্ষমতা-কাঠামোর মাধ্যমে 'মূল্যের বণ্টন' ('allocation of values') করতে সমর্থ। **লাথাম** প্রমুখ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা 'রাজনৈতিক আচরণ' বলতে পরস্পর বিরোধরত গোষ্ঠীগুলির সেইসব আচরণকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের দাবি (claim)-র মধ্যে সমন্বয়সাধন করে।

মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে রাজনীতি

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে **রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার প্রাথমিক নীতিগুলিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মধ্যে** বিশেষভাবে **প্রত্যক্ষ** করা যায়। তবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা রাষ্ট্র-দার্শনিকরা যে-দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতিকে বিচারবিশ্লেষণ করেন, মার্কসবাদীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার পর্যালোচনা করেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতি হল এমন একটি শ্রেণিগত ধারণা, যা ক্ষমতাকে কার্যকর করার কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। রাজনীতি গঠনের পেছনে অর্থনৈতিক উপাদানের চরম প্রভাব থাকায় **লেনিন** (Lenin) রাজনীতিকে **'অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ'** ('concentrated expression of economics') বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, 'রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ' হওয়ায় প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে সমর্থন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে রাজনীতি অর্থনীতির সেবা করে। এখানেই রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রমুখের সঙ্গে মার্কসবাদীদের পার্থক্য। মার্কসবাদীদের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদেরা রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনের একটি অংশ হিসেবে কিংবা অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত নয় বলে মনে করেন।

উৎপত্তি (Origin)

গ্রিক শব্দ *থিওরিয়া* (*Theoria*) থেকে ইংরেজি **'থিওরি'** ('theory') শব্দটি এসেছে। 'থিওরি'র বাংলা প্রতিশব্দ হল 'তত্ত্ব'। আক্ষরিক অর্থে *থিওরিয়া*, অর্থাৎ 'তত্ত্ব' বলতে 'দর্শন' অর্থাৎ দেখা (seeing) বা 'দৃষ্টিপাত' ('beholding') অথবা 'উপলব্ধি' ('taking in')-কে বোঝালেও প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক **প্লেটো** এবং **অ্যারিস্টট্‌ল** সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করেছিলেন। ***থিওরিয়া*** বলতে তাঁরা বৌদ্ধিক দিক থেকে 'জ্ঞান' (*episteme*—knowledge) বা 'বিজ্ঞান' ('science') অথবা 'আত্মদর্শন' ('inward seeing'), অর্থাৎ **'মনের চোখ দিয়ে দেখা'** ('seeing through the eye of mind')-র **নীতিসমূহের অন্বেষণকে** বোঝাতে চেয়েছিলেন। এদিক থেকে বিচার ক'রে **রাষ্ট্রতত্ত্বকে রাজনীতি-সংক্রান্ত জ্ঞান** বলে বর্ণনা করা যায়। **প্লেটো** তাঁর নিজের রচনাবলি (works)-কে 'রাজনীতি-সংক্রান্ত জ্ঞান' ('episteme politike') বলে বর্ণনা করেছিলেন। **আর্নল্ড ব্রেখ্‌ট** (Arnold Brecht)-এর মতে, তত্ত্ব হল এমন এক বা একাধিক প্রস্তাব (proposition)-এর সমষ্টি, যা তথ্য (data) কিংবা প্রত্যক্ষভাবে অপর্যবেক্ষণযোগ্য পারস্পরিক সম্পর্ক (inter-relations not directly observed) অথবা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয়, এমন সব বিষয়কে ব্যাখ্যা করে।

সংজ্ঞা (Definition)

রাষ্ট্রতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়

রাজনীতি-বিষয়ক কতকগুলি 'সাধারণ নীতি' ('general principles')-কে সূত্রবদ্ধ করা হলে তাকে সাধারণভাবে রাষ্ট্রতত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। **ফ্রান্সিস কোকার** (Francis Coker)-এর মতে, সরকার এবং তার বিভিন্ন রূপ ও কার্যাবলিকে সাময়িক ফলাফলের ভিত্তিতে কেবল বর্ণনা, তুলনা ও পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যখন মানুষের প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মতামত অনুধাবন ও মূল্যায়নের তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখনই **রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভব** ঘটে। রাজনীতি-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত, সঙ্গতিপূর্ণ ও তাত্ত্বিক আলোচনাকে **জি. সি. ফিল্ড** (G. C. Field) রাষ্ট্রতত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রতত্ত্ব হল 'যথার্থ সমাজজীবন গঠনের প্রধান প্রধান সূত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ'। 'নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক-সংক্রান্ত আলোচনা' ('the study of the relationship between principles and institutions')-কে **ব্রিয়ান ব্যারি** (Brian Barry) রাষ্ট্রতত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক **জর্জ স্যাবাইন** (George H. Sabine) রাষ্ট্রতত্ত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, গোষ্ঠী-জীবন এবং সংগঠনের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন অনুধাবনই হল রাজনৈতিক তত্ত্ব। **দাঁতে জারমিনো** (Dante Germino)-র মতে, রাষ্ট্রতত্ত্ব হল 'মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের সঠিক বিন্যাস-সংক্রান্ত নীতিসমূহের সমালোচনামূলক পাঠ' ('critical study of the principles of right order in human social existence')। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **ডেভিড ইস্টন** এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'তত্ত্ব' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা যায়। প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক মূল্যবোধ কিংবা রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা তত্ত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর মতে, এই ধরনের তত্ত্বকে **'মূল্যমানযুক্ত তত্ত্ব'** ('value theory') বলে অভিহিত করা যায়। **ইস্টনের** দৃষ্টিতে তত্ত্ব হল কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণার 'সাধারণীকরণ' ('generalisation')। আবার, **জন প্লামেনাজ** (John Plamenatz) রাষ্ট্রতত্ত্বকে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 'একটি বাস্তব দর্শন' ('a practical philosophy') বলে বর্ণনা করেছেন।

রাষ্ট্রতত্ত্বের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এরূপ তত্ত্ব একই সঙ্গে **নীতিমানবাচক** (normative) এবং **অভিজ্ঞতাবাদী** (empirical) তত্ত্ব হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রতত্ত্ব যখন মূল্যবোধযুক্ত (value-oriented) হয়ে কাজ করে, তখন তা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের তত্ত্বগত কাঠামোর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব হিসেবে তা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব কার্যক্রমের দিকটি পর্যালোচনা করে। এদিক থেকে বিচার ক'রে বলা যায়, রাষ্ট্রতত্ত্ব হল **রাজনীতির মৌলিক ধারণা এবং প্রধান প্রধান বিষয়ের পাঠ** (a study of basic concepts and major issues) মাত্র। রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়সূচির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক নিয়োগ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (political participation) প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শ্রেণিবিভাজন (Classification)

ডেভিড ইস্টনের অভিমত

আধুনিক আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **ডেভিড ইস্টন** রাজনৈতিক তত্ত্বকে প্রধানত **দু'টি ভাগে ভাগ** করেছেন, যথা—[১] মূল্যবোধযুক্ত তত্ত্ব (value theory) এবং [২] হেতুবাদী তত্ত্ব (causal theory)। যেসব রাজনৈতিক তত্ত্বে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে এবং যেসব ক্ষেত্রে একটি পূর্বানুমানকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে তত্ত্ব গঠন করা হয়, সেইসব তত্ত্বকে ইস্টন **মূল্যবোধযুক্ত তত্ত্ব** বলে অভিহিত করেছেন। প্রধানত সনাতন বা সাবেকি রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের তত্ত্বকে অনেক সময় **নীতিমানবাচক তত্ত্ব** (normative theory) বলেও বর্ণনা করা হয়। কিন্তু যে-তত্ত্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ে আলোচনা করে, ইস্টন তাকে **হেতুবাদী তত্ত্ব** বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তব জীবনের তথ্যসমূহ হল এরূপ তত্ত্বের মূল

ম্যাকডুগাল প্রমুখ তাত্ত্বিক এই তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা।

প্রশ্ন ১১ (ক)। রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা নির্দেশ কর। (Point out the role of Political Theory) *OR Importance of Political theory.* (5)

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু থেকেই রাজনৈতিক তত্ত্বের শুরু। এই তত্ত্ব শুধু মানুষের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, কী ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন সর্বোৎকৃষ্ট, কীভাবে সেই অভীষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেবার চেষ্টা করে। প্ল্যামেনাজ (G. P. Plamanatz) বলেছেন, রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল আমরা কী করব এবং কীভাবে করব তা ঠিক করতে সাহায্য করা ("Its purpose is to help us to decide what to do and how to go about doing it.")। তবে যে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব বা ভূমিকা এক নয়। সনাতন বা ধ্রুপদী (Classical) রাজনৈতিক

তত্ত্ব যে ভূমিকা পালন করেছে, আধুনিক বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা তার থেকে স্বতন্ত্র। আবার মার্কসবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা এ দুটির থেকেই সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক তত্ত্বের এই তিন মূল ধারা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

(ক) সনাতন রাজনৈতিক তত্ত্ব (Classical Political Theory) সনাতন রাজনৈতিক আলোচনায় রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে কোনওরূপ তফাৎ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এই ধারণা বজায় ছিল। এই সময়কার রাষ্ট্রদার্শনিকদের প্রবণতা ছিল একটি সাধারণ বা সর্বজনীন আদর্শকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া, যে-কোনও সমস্যাকে নৈতিক লক্ষ্য দিয়ে বিচার করা এবং ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের নিরিখে সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করা। উদাহরণ স্বরূপ **প্লেটোর** রাষ্ট্রদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রজীবনে আদর্শ ন্যায়ধর্ম সম্পর্কে এক তর্কাতীত সর্বজনীন সূত্র নিরূপণ করা। এটা করতে গিয়ে তিনি তদানীন্তন বাস্তব রাষ্ট্রজীবনধারা থেকে তথ্য আহরণ করেননি। তিনি শুরু করেন আদর্শ এক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা দিয়ে এবং এই বর্ণনার মাধ্যমে তিনি গড়ে তোলেন সামাজিক সুবিচার বা ন্যায়ধর্মের এক আদর্শ সর্বজনীন নীতি। তত্ত্ব এখানে এসেছে বটে, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে আদর্শ, নৈতিকতা, বিশেষ মূল্যবোধ। প্লেটোর ন্যায় **অ্যারিস্টটলও** তাঁর গুরুর ন্যায় আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তবে অ্যারিস্টটলের প্রখর বাস্তবজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাবাদী (emperical) দৃষ্টিকোণ তাঁকে আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেনি। পরবর্তী কালে রুশো, বেন্থাম, হেগেল, গ্রীন প্রমুখ যে রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করেছেন, সেখানেও তত্ত্ব ও দর্শনের সীমারেখা খুব একটা স্পষ্ট ছিল না।

(খ) বুর্জোয়া রাজনৈতিক তত্ত্ব (Bourgeois Political Theory) ঃ রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্যে সীমারেখাটি স্পষ্ট হতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। এখন থেকেই তত্ত্ব এবং এর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন চিন্তাভাবনার বিকাশ ক্রমে লক্ষ্য করা গেল। **কোঁত, স্পেনসার, ম্যাক্সওয়েবার** প্রমুখ চিন্তাবিদ দার্শনিক চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্তরে উত্তীর্ণ করেছেন। কোঁতের 'দৃষ্টবাদ' (Positivism) এবং ম্যাক্স ওয়েবারের 'নয়া-দৃষ্টবাদ' বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রাজনৈতিক তত্ত্বের জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। এইসব সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার কাজে অভিজ্ঞতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং গবেষণার ক্ষেত্র থেকে মূল্যবোধকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এঁদের হাত ধরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙিনায় যে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটে, তা একই সঙ্গে রাজনৈতিক তত্ত্বকে মূল্যমান-নিরপেক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে এবং তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। **ইস্টনের** মতে, নিছক ঘটনা বা তথ্যের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা যায় না। ঘটনাসমূহকে এমনভাবে বিন্যাস করা দরকার যার ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা সম্ভব হয়। এইসব ঘটনার বিন্যাসে ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনায় সর্বজনীনতার মাত্রা (level of generality) যত বেশি থাকবে, জ্ঞানের প্রসারও তত বেশি হবে। তাই আচরণবাদীদের মতে, বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক জ্ঞান (reliable political Knowledge)-এর জন্যই রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন। তথ্য না থাকলে তত্ত্বের যেমন কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকে না, তেমনি কোনোরূপ তাত্ত্বিক ভিত্তি না থাকলে তথ্যও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর শুষ্ক সংকলন হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতপক্ষে তথ্য ও তত্ত্ব উভয়ের যৌথ অবদানে গড়ে ওঠে যথার্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

আচরণবাদীদের মতে, আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো মনে হলেও মানুষের রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং সেই কারণে রাজনৈতিক আচরণকেও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা সম্ভব। এই রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক

ব্যবস্থার আলোচনা সম্ভবপর হয়। আচরণবাদিগণ রাজনৈতিক তত্ত্বের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এর তিন প্রকার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) তত্ত্ব কোনও গবেষককে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনীয় (Variables) বা উপাদান-সমূহকে সনাক্ত করতে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। কোনও গবেষক তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলির বিন্যাসসাধন করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন শুধু তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। অন্যভাবে বললে, একটি তাত্ত্বিক কাঠামো (theoretical framework) ছাড়া কোনও গবেষক তাঁর কাজকে অর্থবহ করে তুলতে পারেন না।

(২) তত্ত্ব একই সঙ্গে গবেষণার তুলনামূলক পর্যালোচনার পথ প্রশস্ত করে এবং গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

(৩) একটি তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত তার তাত্ত্বিক কাঠামোর সাহায্যে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। তবে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবেষণা চালিয়ে যদি কোনও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। আচরণবাদীরা তাঁদের গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি এই কারণে যে, তাঁরা মুখে মূল্যবোধহীন রাজনীতির কথা বললেও বাস্তবে তাঁরা বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতার আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। তাই তাঁদের নির্মিত তত্ত্ব বুর্জোয়া সংস্কারের বেড়াজালে আটকে থেকেছে এবং সঠিক বস্তুনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছে।

(গ) **মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব (Marxist Political Theory)** মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব উপরিউক্ত দুটি তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। সনাতন রাজনৈতিক তত্ত্ব হল মূলত ভাববাদী। এই তত্ত্ব বাস্তবে 'কী আছে' (What is) তাকে গুরুত্ব না দিয়ে 'কী হওয়া উচিত' (What ought to be)—তার ওপর বেশি প্রাধান্য দেয়। এছাড়া এই তত্ত্বে বিশেষ কোনও ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করে অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ মানুষ স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর, লোভী এবং হিংস্র—এই পূর্বানুমানের ওপর দাঁড়িয়ে হবস্ তাঁর চুক্তিতত্ত্বটি নির্মাণ করেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে যে মার্কসীয় তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তা কোনও প্রকার কল্পনা বা ভ্রান্তধারণাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আবার মার্কসীয় তত্ত্ব আচরণবাদ থেকেও আলাদা, কারণ আচরণবাদী তত্ত্ব যেখানে প্রচলিত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করায় আগ্রহী, মার্কসবাদ সেখানে প্রচলিত শ্রেণীভিত্তিক-শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে শ্রেণীহীন শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ করে। মার্কস নিজেই বলেছিলেন, "আজ পর্যন্ত দার্শনিকরা কেবল জগৎকে ব্যাখ্যাই করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল একে পরিবর্তন করা"। বস্তুতপক্ষে মার্কসবাদ নিছক কোনও তত্ত্ব নয়, মার্ক্সবাদ হল সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়ার পথ-নির্দেশিকা (a guide to action)। মার্কসবাদ কোনও অপরিবর্তনীয় এবং যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস (dogma) নয়, এটি গতিশীল এবং নিরন্তর বিকাশমান। মার্কসবাদের এই গতিশীল চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে **এমিল বার্নস** বলেছেন, "বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো মার্কসবাদও গড়ে উঠেছে অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও পৃথিবী সংক্রান্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে। তাই তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদের শেষ সীমারেখা টেনে দেওয়া সম্ভব হয়নি। যতই ইতিহাসের অগ্রগতি হয় এবং মানুষ অধিকতর পরিমাণে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে, ততই মার্কসবাদও ক্রমাগত সমৃদ্ধ হতে থাকে। মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর মৃত্যুর পর মার্কসবাদকে যাঁরা সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেনিন, স্তালিন, মাও জে. দঙ্, লুকাচ, গ্রামশি প্রমুখ।

প্রশ্ন ৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ঐতিহ্যগত বা সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ ব্যাখ্যা কর। [Discuss the traditional approaches to Political Science.)

[N.B.U. 2001 ; B.U. '95, '98, 2002 ; C.U. '85, '88, '93, '95, '96, '98]

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় যে সকল দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত থাকতে দেখা যায় সেগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সাবেকী বা ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং (২) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে সেইসব দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায় যেগুলি একদা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এ্যালান বল দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং আইনানুগ দৃষ্টিভঙ্গিকে সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ছিল প্রায় একচেটিয়া। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করার সাথে সাথে সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি কিছুটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি মূলত আদর্শ স্থাপনকারী (normative) ; বর্ণনাত্মক (descriptive), অবরোহী (deductive), প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক (institutional) এবং আত্মদর্শনমূলক (introspective)।

(ক) **দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** প্রাচীনত্বের দিক থেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির স্থান সর্বাগ্রে। রাষ্ট্র ও মানুষের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি আদর্শ বা কাম্যরূপ নির্ধারণ করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, সমাজে ব্যক্তির স্থান, আইন প্রভৃতি বিষয়ে মৌলনীতি স্থির করাই ছিল দার্শনিকদের প্রধান লক্ষ্য। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোন একটি সাধারণ অনুমানকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে অবরোহীমূলক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজতে সুদূরপ্রসারী কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সুপ্রাচীন গ্রীক সভ্যতাকে সর্বনাশা অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাতে এমন এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র আঁকলেন যার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। এছাড়া এই দৃষ্টিভঙ্গিতে 'কী হয়' (What is)-এর পরিবর্তে 'কী হওয়া উচিত' (What ought to be)-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকগণের আলোচনায় ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পায়। প্রাচীন গ্রীকদার্শনিক প্লেটোর ন্যায় হেগেল, গ্রীন, ব্রাডলে, বোসাংকোয়েত প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও আদর্শ রাষ্ট্রের অনুসন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তবে দার্শনিকরা সকলেই যে পূর্ব-অনুমিত ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা নয়। এ্যারিস্টটলের Politics, ম্যাকিয়াভেলীর The Prince, হবসের Leviathan প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সমকালীন রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জাত। বস্তুত কোন রাজনৈতিক দর্শনই সমাজ-নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

(খ) **ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এ্যালান

বল অন্যতম সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গি বলে উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের মতে, কোন কিছুকে বুঝতে হলে তার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসকে জানা দরকার। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানের কর্মসূচী নির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব বলে তাঁদের বিশ্বাস। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট বলেছেন, ইতিহাস কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করে না, ভবিষ্যতের নির্দেশক হিসাবে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও সাহায্য করে। স্যার আইভর জেনিংস ব্রিটেনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে কিভাবে পার্লামেন্ট, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি গড়ে ওঠে সেগুলিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেন। তাঁর এই আলোচনা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে বোঝার জন্য আজও অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে নানা তথ্য ও সম্পদে সমৃদ্ধশালী করেছে। ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি মূলত বর্ণনাত্মক (descriptive)।

তবে একটি দেশ বা জাতির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক চিত্রটি রাজনৈতিক ইতিহাসে বিধৃত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ জেনিংস ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করেছেন তার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পরিস্ফুট হয় নি। তাই ঐতিহাসিকের সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঐতিহাসিকগণ নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন। ঘটনার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট আলোচনা পদ্ধতির কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। সাবেকী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তেমন কোন কাঠামো গড়ে তুলতে পারে নি। বিচ্ছিন্ন আলোচনা ও বর্ণনার সীমাবদ্ধতাকে দূর করে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পথনির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছেন কার্ল মার্কস।

(গ) **আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি :** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন দীর্ঘদিনের। ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) বলেছেন, ১৯১৪ সালের আগে আইনগত ব্যবস্থা ব্যাখ্যা না করে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশ্লেষণ করার কথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা চিন্তাই করতেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা রাষ্ট্রকে কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্থা হিসাবে না দেখে কেবলমাত্র একটি আইনগত সংস্থা হিসাবে দেখে থাকেন। এঁরা রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রকার সম্পর্ককে কেবলমাত্র আইনগত দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকেন। ডাইসি, হেনরী মেইন, পোলক, হল্যাণ্ড প্রমুখ চিন্তাবিদগণ আইনের সাহায্যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধানত দেশের শাসনতন্ত্র, আইনগত সার্বভৌমিকতা, আইনের অনুশাসন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আইনগত কাঠামো ও কার্যাবলীর মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকেরা তাঁদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী।

আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট, কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আইনগত গণ্ডীর বাইরে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করা হয় না। বাস্তবিকপক্ষে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়ন কেবলমাত্র আইনগত দিক থেকে করা যায় না। তাছাড়া এই দৃষ্টিভঙ্গি অবৈজ্ঞানিকও বটে, কারণ রাষ্ট্রের আইন, শাসনতন্ত্র, সরকার ইত্যাদি যে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি সেই সত্যকে উপেক্ষা করে।

সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ঃ সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

প্রথমত, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক আলোচনাকে মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় থাকে যে মানুষ, সেই মানুষের সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখান হয় না এই দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর্থার বেন্টলির মতে, দীর্ঘদিন যাবৎ সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল থাকে, যেমন রাজনৈতিক দল, জনমত, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ইত্যাদি, এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলি উপেক্ষিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তঃসমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক (inter-disciplinary) আলোচনায় উৎসাহ দেখান হয় নি। অথচ এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ এবং ফলপ্রসু করতে হলে অন্যান্য সামাজিক-বিজ্ঞানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

চতুর্থত, সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির অপর একটি মারাত্মক দুর্বলতা হল এই যে, এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে কেবলমাত্র উন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। অনুন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের আলোচনায় স্থান পায় নি।

পঞ্চমত, আধুনিক কালের আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজস্থ ব্যক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ না করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই দিকটিও উপেক্ষিত হয়েছে।

ষষ্ঠত, সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে আর একটি বিষয়ও অবহেলিত হয়েছে এবং সেটি হল আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও প্রতিষ্ঠান। আধুনিক যুগ হল আন্তর্জাতিকতার যুগ। এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করার জন্য সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গির আবেদন কমে গেলেও, এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ও প্রভাবকে আজও অস্বীকার করা যায় না। এখনও কোন কোন রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলায় সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নেওয়া হয়। এ্যালান বল বলেছেন, মুখে যাই বলুন, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত প্রধানত বর্ণনাত্মক ও প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির (descriptive and institutional approaches) সাহায্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা করে থাকেন। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিগুলি জানা যায় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের সুপারিশ করা যায়।

হল একটি 'দৃষ্টিভঙ্গি' যা রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাবাদী দিকসমূহকে ব্যাখ্যা করতে চায়।

আচরণবাদের বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে আচরণবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধরা দিয়েছে। প্রাসঙ্গিক ক্রমে কার্কপ্যাট্রিক (E. M. Kirkpatrick), ডেভিড ইস্টন (David Easton), ইউলাউ (Heinz Eulau) ও অন্যান্যদের বক্তব্য স্মরণীয়। কার্কপ্যাট্রিক আচরণবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল : (১) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নয়, গবেষণার মৌলিক একক হল ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণ, (২) আচরণবাদ আন্তঃসমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনার বিকাশ সাধন করতে চায় এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে চায়, (৩) আচরণবাদ সুস্পষ্ট পদ্ধতিগত কৌশল গ্রহণ যেমন পরিসংখ্যান, তথ্য সংগ্রহ ও সেসবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শ্রেণীবিভাজন এবং পরিমাপকরণের উপর জোর দেয়, (৪) আচরণবাদের লক্ষ্য হল সুসংবদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গঠন করা।

ইউলাউ, এলডার্সভেল্ড ও জানোউয়িটজ (H. Eulau, S. J. Eldersveld and M. Janowitz) তাঁদের *Political Behaviour : A Reader in Theory and Research* নামক সংকলনগ্রন্থের ভূমিকায় আচরণবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে এগুলি হল : (১) আচরণবাদ তাত্ত্বিক ও অভিজ্ঞতাবাদী উভয় ধরনের বিশ্লেষণের একক ও উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের আচরণকে নির্দিষ্ট করে থাকে, (২) আচরণবাদ সামাজিক মনঃস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব অর্থাৎ আন্তঃসমাজবিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও গবেষণাকে স্থাপন করতে চায়, (৩) আচরণবাদ তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক বা আন্তঃনির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে, (৪) আচরণবাদ কঠোর গবেষণাগত পরিকল্পনার বিকাশসাধন এবং রাজনৈতিক আচরণগত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের নির্ভুল পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে চায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ডেভিড ইস্টন আচরণবাদের কয়েকটি গঠনকারী উপাদানকে এই আন্দোলনের বৌদ্ধিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এগুলি হল : (১) নিয়মমাফিকতা, (২) সত্যতা যাচাই বা প্রমাণ, (৩) কৌশল উদ্ভাবন, (৪) সংখ্যায়ন, (৫) মূল্যমান নিরপেক্ষতা, (৬) সুসংহতকরণ, (৭) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং (৮) সংহতি সাধন।

উপরিউক্ত ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত অভিমতের ভিত্তিতে আচরণবাদের প্রধান

বৈশিষ্ট্যগুলিকে এইভাবে চিহ্নিত করা যায় :

প্রথমত, আচরণবাদ ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ব্যক্তির আচরণ বলতে ব্যক্তির একক বা গোষ্ঠীবদ্ধ আচরণকে বোঝান হয়। আচরণবাদী ধারণা অনুসারে ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণের পর্যালোচনা হল রাজনীতির পর্যালোচনা।

দ্বিতীয়ত, আচরণবাদ আন্তঃসমাজবিজ্ঞানমূলক সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে চায়। এই ধারণা অনুসারে আন্তঃসমাজবিজ্ঞানমূলক সহযোগিতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমস্যাবলীকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব; কারণ, ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণ তার সামগ্রিক আচরণের অচ্ছেদ্য অংশ।

তৃতীয়ত, আচরণবাদ তত্ত্ব ও গবেষণার পরস্পর নির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণার উদ্দেশ্যের দিক থেকে তাত্ত্বিক প্রশ্নাবলীর এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাজাত ফলাফলের গুরুত্ব রয়েছে। আচরণবাদ হল আত্মসচেতনভাবে তত্ত্বমুখীন।

চতুর্থত, আচরণবাদ গবেষণা ও তত্ত্বনির্মাণের জন্য কঠোরভাবে নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করার পক্ষপাতী। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধানের জন্য পরিশীলিত পদ্ধতি ও কৌশলের উপর গুরুত্ব দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা অপেক্ষা অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের নির্ভুলতা অনেক বেশি জরুরী।

পঞ্চমত, আচরণবাদের লক্ষ্য হল সুসম্বদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব নির্মাণ করা। আচরণবাদ দার্শনিক, আইনকেন্দ্রিক অনুমাননির্ভর অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি বর্জন করেন। আচরণবাদীরা অভিজ্ঞ কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাবাদী তথ্য সংগ্রহ, সেসবের শ্রেণীবিভাজন, পরিমাপকরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব নির্মাণ করতে চান।

ষষ্ঠত, আচরণবাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র বিভিন্ন মাপের (range) অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব নির্মাণই নয়, এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করা। আচরণবাদের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি দিকই এই চূড়ান্ত লক্ষ্যের সূত্রে গ্রন্থিত। সাবেকী রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার অনুমান নির্ভর অবাস্তবতা বা মূল্যবোধাত্মক আলোচনাকে বর্জন করা অথবা প্রকৃতি বিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ, আন্তঃসমাজবিজ্ঞানমূলক সহযোগিতার প্রসার, যাচাইযোগ্য অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব নির্মাণ—এসব কিছুরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

সর্বোপরি, আচরণবাদ দুটি ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করেছে—একটি হল তত্ত্বনির্মাণ ও অপরটি হল গবেষণার কৌশলসমূহ। অবশ্য গবেষণার কৌশলসমূহের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন এসেছে তা তাত্ত্বিক বিপ্লবকে অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আচরণবাদের প্রভাবে নতুন কৌশল ও প্রণালীর বিকাশ সাধিত হয়েছে ও সেগুলি পরিশীলিত হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা : আচরণবাদী বিশ্লেষণধারার বিকাশের সাথে সাথে এর কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে ওঠে। এগুলি হল :

প্রথমত, আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রণালীগত উদ্ভাবনের দ্বারা আচ্ছন্ন থেকেছেন। তাঁরা গবেষণা ও অনুসন্ধানের কৌশল, পদ্ধতি ইত্যাদির পরিশীলিতকরণের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, প্রণালীগত দিকটির প্রতি আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আচ্ছন্নতার ফলে সাধারণভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁরা সমাজের প্রধান সমস্যাগুলিকে পরিহার করেছেন এবং পরিশীলিত

গবেষণা প্রণালী, পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের সাহায্যে তাঁরা তুচ্ছ ও তাৎপর্যহীন বিষয়গুলির গবেষণায় নিবদ্ধ থেকেছেন।

তৃতীয়ত, আচরণবাদের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আন্তঃ সমাজবিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে মনোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির বিশেষত সমাজবিদ্যার অংশ বা শাখা শাস্ত্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

চতুর্থত, মূল্যবোধহীন আলোচনা ক্ষতিকারক। এতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাদের সামাজিক দায়িত্বপালনে অর্থাৎ সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে ব্যর্থ হবেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা বিনষ্ট হবে।

পঞ্চমত, আচরণবাদী বিশ্লেষণধারার পদ্ধতি ও কৌশলগুলি অংশসমূহের সম্পর্কগুলি উপলব্ধি ও বিশেষণের সহায়ক। কিন্তু সেগুলি সমগ্র বুঝবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

ষষ্ঠত, আচরণবাদ প্রকারান্তে স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে সচেষ্ট। লিও স্ট্রস (Leo Strauss) বলেছেন, আচরণবাদ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পূজারী।

সপ্তমত, আচরণবাদী পর্যালোচনা ও গবেষণায় অনেক সময় এমন সব বিষয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে যেগুলি সত্যই রাজনৈতিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এজন্য খ্রিস্টীয়ান বে (Christian Bay) মনে করেন, আচরণবাদ প্রকৃত রাজনীতির তত্ত্ব নয়, তা হল ছদ্ম রাজনীতির তত্ত্ব।

আচরণবাদোত্তর বিপ্লব
Post-Behavioural Revolution

আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বিশেষত ৫০-এর দশকে যার রমরমা ৬০-এর দশকেই সেই আচরণবাদের সংকট দেখা দেয়। ৬০-এর দশক শেষ হতে না হতেই আচরণবাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। শুধু সনাতনী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদেরই নয়, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের একাংশেরও সমালোচনা ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকার প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টনের নেতৃত্বে জন্ম নেয় আর একটি বৈপ্লবিক প্রবণতার যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার জগতে আচরণবাদোত্তর বিপ্লব নামে পরিচিত।

আচরণবাদোত্তর বিপ্লব হল একইসঙ্গে একটি আন্দোলন ও একটি বৌদ্ধিক প্রবণতা। এর উদ্ভব ঘটেছে আচরণবাদের প্রতিক্রিয়ায়। এর উৎসমূলে নিহিত রয়েছে আচরণবাদী বিশ্লেষণ ধারার প্রতি

---

1. V. Van Dyke : Political Science : A philosophical Analysis, pp 159-60.

ক গভীর অসন্তোষ। কিন্তু আচরণবাদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় এর জন্ম হলেও সাবেকী রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার মতন আচরণবাদোত্তর বিপ্লব স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী ও রক্ষণশীল নয়। বরং তা ভবিষ্যৎমুখী (future oriented)—কারণ তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এক নতুন গতিমুখে চালিত করতে চায়। এর প্রকৃতি ব্যাখ্যায় ইস্টন বলেছেন 'This new development is then a genuine revolution, not a reaction ; a becoming not a preservation ; a reform, not a counter-reformation.'[9]

বৈশিষ্ট্য : আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের মূল দাবী (battle cries) হল প্রাসঙ্গিকতা ও কাজ (relevance and action)। এর কয়েকটি স্পষ্টভাবে সনাক্তযোগ্য ধারণা বা মূল বক্তব্য (The tenets of its faith) রয়েছে। ইস্টন এগুলিকে "প্রাসঙ্গিকতার বিশ্বাস" (a credo of relevance) বলেছেন। এই বিশ্বাসগুলিই হল ইস্টনের মতে আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য। এগুলি হল[10] :

(ক) কৌশলের আগে বিষয়বস্তুকে স্থান দিতে হবে। যেখানে আচরণবাদের মূলকথা ছিল অস্পষ্ট হওয়ার থেকে ভ্রান্ত হওয়াও ভাল সেখানে তার জায়গায় আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের মূলকথা হল অপ্রাসঙ্গিকভাবে নির্ভুল হওয়ার চেয়ে অস্পষ্ট হওয়াও শ্রেয়তর।

(খ) আচরণবাদ অভিজ্ঞতাবাদী রক্ষণশীলতার মতাদর্শকে গোপন করে থাকে। এটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তথ্য ও ঘটনার উপলব্ধিকে বাধা প্রদান করে।

(গ) আচরণবাদ অবশ্যই বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলে কারণ তা রাজনীতির নির্মম বাস্তবতাকে গোপন করতে চায়। অন্যদিকে আচরণবাদোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হল নীরবতার বেড়াকে ভেঙ্গে ফেলা এবং সংকটকালে মানবজাতির প্রকৃত প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া।

(ঘ) মূল্যবোধের সার্বিক বর্জন নয়; মূল্যবোধের গঠনমূলক বিকাশ এবং সে বিষয়ে গবেষণা রাজনীতি চর্চার অপরিত্যাজ্য অংশ।

(ঙ) বুদ্ধিজীবি বা বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবশ্য পালনীয় ভূমিকা হল সভ্যতার মানবিক মূল্যবোধগুলিকে রক্ষা করা।

(চ) জানার সাথে সাথেই কাজ করার দায়িত্ব এসে যায় এবং কাজ করার অর্থ হল সমাজ পুনর্গঠনে নিয়োজিত হওয়া। বিজ্ঞানী হিসাবে বুদ্ধিজীবির বিশেষ দায়বদ্ধতা হল জ্ঞানকে কাজে প্রয়োগ করা।

(ছ) বুদ্ধিজীবিদের এই দায়বদ্ধতার কারণেই বুদ্ধিজীবিদের সংগঠনগুলি যেমন পেশাদার সংঘ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বর্তমানকালের চলমান সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে পারে না। পেশাসমূহের রাজনীতিকীকরণ ইপ্সিত ও অপরিত্যাজ্য।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনৈতিক বিষয়াবলীর বিচার-বিশ্লেষণ, গবেষণা ও তত্ত্বায়নের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উনিশ শতকীয় সংযোজন হল মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসবাদকে অবলম্বন করেই এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কসবাদের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা ঘটে। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ছিলেন এই মতধারার প্রতিষ্ঠাতা। মার্কসবাদের বিকাশে মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা ও তত্ত্বাকার ভি. আই. লেনিনের অনন্য-সাধারণ অবদানের জন্য একে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল বিচারধারা এবং প্রত্যয়সমূহকে অবলম্বন করেই রাজনীতি বিষয়ক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটেছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমসাময়িককালে বহুল-অনুসৃত রাজনৈতিক বিষয়সমূহের আনুষ্ঠানিক, আইনগত ও বর্ণনামূলক বিশ্লেষণধারা বর্জন করেন এবং রাজনীতি অধ্যয়নে সমাজবিদ্যাগত (Sociological) বিশ্লেষণভঙ্গি প্রবর্তন করেন। এই বিশ্লেষণভঙ্গির শিকড় রয়েছে তাদের দ্বন্দ্বমূলক

ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার মধ্যে। তাঁরা যে নতুন বিশ্লেষণধারা প্রবর্তন করেন তা চিন্তা জগতে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রচলিত উদারনৈতিক বিশ্লেষণধারার সঙ্গে মার্কসীয় বিশ্লেষণধারার ব্যাপক ও আমূল পার্থক্য দেখা দেয়। পরবর্তীকালে উদারনৈতিক বিশ্লেষণধারার ক্ষেত্রে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিবর্তন-উদ্ভাবন ও উন্নতিসাধন ঘটে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির জগতটি দুটি মৌলিক ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে; তা হল—মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও অমার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

স্পষ্টতই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা একে এক ধরনের অনন্যতায় ভূষিত করেছে।

প্রথমত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি গড়ে উঠেছে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার উপর। এর একদিকে রয়েছে দ্বন্দ্বতত্ত্ব আর অন্যদিকে রয়েছে বস্তুবাদী ধারণা। দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূলকথাগুলি হল : (ক) এজগতের সবকিছুই পরস্পর নির্ভরশীল; (খ) একটির পরিবর্তন অপরটিকে প্রভাবিত করে; (গ) সবকিছুই পরিবর্তনশীল, কোন কিছুই স্থির বা নিশ্চল নয়। পরিবর্তনের প্রধান নিয়মগুলি হল : (i) বৈপরীত্যের ঐক্য ও সংগ্রাম, (ii) বাতিলের বাতিলকরণ এবং (iii) পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন বা বৈপ্লবিক উল্লম্ফন সাধিত হয়।

একই সঙ্গে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল বস্তুবাদী। দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিয়মগুলি বস্তুজগতে ক্রিয়াশীল; মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে (ক) এই জগৎ হল বস্তুময়; (খ) বস্তুজগৎ আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল; (গ) বস্তুজগতই প্রাথমিক; (ঘ) বস্তু থেকেই চেতনার উদ্ভব ঘটে; (ঙ) বস্তুজগৎ থেকে উদ্ভূত চেতনা বস্তুজগতকেও প্রভাবিত করে থাকে; (চ) বস্তুজগতের সবকিছুই মানুষের জ্ঞাত নয়, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে তা জানা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মার্কসবাদ হল একটি সমগ্র বিশ্বধারণা। প্লেখানভ (Plekhanov) বলেছেন যে, "Marxism is a whole world view." মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র কিছু দার্শনিক ধারণার সমষ্টি নয়; এর মধ্যে দর্শন ছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও মতামত, বিশ্বকে উপলব্ধি ও রূপান্তরের মতবাদ এবং শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে সমাজ পরিবর্তনের নির্দেশিকা। মানবসমাজের সামগ্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়া, তার প্রকৃতি ও গতিমুখ এর সাহায্যে অনুধাবন করা যায়।

তৃতীয়ত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিষয়াবলীকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ সম্পর্কের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। এতে সমাজকে এক অখণ্ড ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হয়। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে এই জগতের সবকিছুই পরস্পর-সম্পর্কিত ও আন্তঃক্রিয়াশীল। স্বভাবতই এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রাজনীতিও সমাজের একটি অংশ বা দিক। কাজেই সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিষয়াবলী ও ঘটনাবলীর স্বরূপ ও গতিধারা সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর প্রাধান্য স্বীকৃতি পেয়েছে। মার্কসবাদে রাজনীতিকে অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ হিসাবে দেখা হয়। আর এই কারণেই এতে রাজনীতি ও অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজের অর্থনৈতিক

বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যে সামাজিক উপরিকাঠামো তার সবচেয়ে নমনীয় অংশ হল রাজনীতি। কাজেই রাজনীতি অর্থাৎ সমাজের শ্রেণী কাঠামো ও শ্রেণীসম্পর্কসমূহ, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, আইন, রাজনৈতিক, ধ্যানধারণা ও মতবাদ, মূল্যবোধ ইত্যাদি সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়, নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করে ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তবে এই সম্পর্ক সর্বদা একমুখীন নয়। রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, মতবাদ, মূল্যবোধও সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চমত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বিশেষত্ব হল ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার ধারণা (concept of historical specificity)। মার্কসবাদ কোন রাজনৈতিক ঘটনা বা প্রবাহকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পূর্বানুমানের দ্বারা চালিত হওয়ার বিরোধী। পরিবর্তে তা প্রতিটি ঘটনার নির্দিষ্ট ও বাস্তব বিশ্লেষণ করার কথা বলে। এই কারণে মার্কস ও এঙ্গেলস্ রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের কথা বললেও রাষ্ট্রের অল্পস্থায়ী ও আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেণী নিরপেক্ষতার ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমগুলিকে উপেক্ষা করেননি। বরং সেগুলিকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

ষষ্ঠত, একইভাবে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় বিশিষ্টতার (national specificity) বিষয়টিও উপেক্ষা করেনি। যেমন শাসকশ্রেণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারিয়েতের পক্ষে গ্রহণীয় প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থার কথা *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে* উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে এই স্বীকৃতিও রয়েছে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই গ্রহণীয় ব্যবস্থাগুলি হবে ভিন্নতর। অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে মানব সমাজের বিকাশের যে রূপরেখা উপস্থাপিত করা হয়েছে তা একটি সাধারণ রূপরেখা মাত্র। জাতীয় ও ঐতিহাসিক বিশিষ্টতাকে এতে উপেক্ষা করা হয়নি। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গি যান্ত্রিকতা এবং অতিসরলীকৃত, সাধারণীকৃত ধারণাকে প্রশয় দেয় না।

সপ্তমত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক বিষয় ও ঘটনাবলীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেইসব রাজনৈতিক ঘটনা ও বিষয় এবং সেসবের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়গুলির বিকাশমূলক দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ, মার্কসবাদ অনুসারে গতি, পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ— এগুলি হল বস্তুর শাশ্বত ও আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। এঙ্গেলস বলেছেন, "গতি হল বস্তুর অস্তিত্বের ধরন।" স্বাভাবিকভাবেই, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক ঘটনা ও বিষয়াবলীর গতি, পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের দিকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এই কারণেই মার্কসবাদ পুঁজিবাদী সমাজকে একটি স্বাভাবিক, চিরন্তন সমাজ হিসাবে দেখার পরিবর্তে একটি পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনযোগ্য সমাজ হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। এই বিকাশমূলক দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার কারণেই লেনিন রুশদেশের বিপ্লবে হিংসার আবির্ভাবের প্রশ্নে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়নে উপনীত হয়েছিলেন।

অষ্টমত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতার ধারণায় আস্থাশীল নয়। এর প্রধান কারণ হল মার্কসবাদীরা মনে করেন একজন ঐতিহাসিক-গবেষক-বিশ্লেষক বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেন, কিন্তু একজন সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ বা মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর মার্কসবাদ নিজেকে সর্বহারা শ্রেণীর দর্শন ও নির্দেশিকা বলে দাবী করে থাকে। কাজেই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল স্পষ্টতই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি। এই শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকেই মার্কসবাদীরা রাজনৈতিক বিষয়াবলীকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকে। মার্কসবাদীরা মনে করেন তথ্যানুসন্ধানের

ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা সম্ভব ও আবশ্যক। কিন্তু তার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। যারা মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতার কথা বলে থাকেন তারা আসলে তাদের মৌল সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান ও উদ্দেশ্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেন।

নবমত, এই শ্রেণীগত অবস্থান গ্রহণের কারণেই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বিশিষ্টতাদায়ক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে নিহিত পরিবর্তনকামীতা। কার্ল মার্কস (Karl Marx) তাঁর *Theses of Feuerbach*-এ লিখেছেন, "The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it." কাজেই মার্কসবাদ অনুসারে সমাজ ও রাজনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হল এর পরিবর্তনসাধন। কাজেই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণকারী একজন সমাজবিজ্ঞানী বা গবেষক বিশ্লেষকের দায়িত্ব হল শ্রেণীশাসন ও শ্রেণীশোষণমূলক সমাজব্যবস্থার মৌল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সপক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ।

দশমত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্ব ও ব্যবহারের ঐক্য সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ব্যবহারিক জ্ঞান থেকে তত্ত্ব গড়ে তোলা এবং তত্ত্বকে ব্যবহার ও অনুশীলনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তত্ত্ব ও ব্যবহারের এই ঐক্যসাধন ছাড়া জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় ধ্রুপদী মার্কসবাদে। উদাহরণস্বরূপ, কার্ল মার্কস-এর *The Class Struggle in France, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, The Civil War in France* প্রভৃতি গ্রন্থে এবং এঙ্গেল্‌সের *The Housing Question* ও *Revolution and Counter-Revolution* গ্রন্থে বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া লেনিনের *The State and Revolution, The State* ইত্যাদিতেও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় তাঁদের মতে রাজনীতির দুটি মুখ্য ধারণা হল রাষ্ট্র ও ক্ষমতা। তাঁদের রচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রাজনীতি হল সামাজিক উপরিকাঠামোর সবথেকে সক্রিয় ও নমনীয় অংশ। এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী জাতি, ব্যক্তি ও শ্রেণীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা, তাদের দ্বন্দ্ব ও সমঝোতা রেখাচিত্রের মতন প্রতিফলিত হয়।

ফিওদোর বুরল্যাটস্কি (Fyodor Burlatsky) মার্কসবাদের রাজনীতি বিষয়ক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলির উল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লেখিত মার্কসীয় মতবাদগুলি হল : (ক) ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর তত্ত্ব, রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতির উপর বৈষয়িক দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতির চূড়ান্ত প্রভাব; (খ) অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের উপর রাষ্ট্র, আইন ও রাজনীতির পারস্পরিক প্রভাব; (গ) শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব এবং সমাজবিকাশের ভিত্তি হিসাবে বিশেষভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের তত্ত্ব; (ঘ) বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও রাজনীতির অনিবার্য অপসারণ ও সেই জায়গায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রতিস্থাপন এবং সাম্যবাদী স্তরে রাষ্ট্র ও রাজনীতির উবে যাওয়া সংক্রান্ত বক্তব্য।

অবশ্য মার্কস-এঙ্গেল্‌স পরবর্তীকালে মার্কসবাদের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। ফলে রাজনীতি বিষয়ক অনেক নতুন বিষয় ও তত্ত্ব এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। যেমন দলীয় নীতি ও সংগঠন সংক্রান্ত লেনিনীয় মতবাদ, সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত মতবাদ, মাও জে-দং-এর তিন দুনিয়ার তত্ত্ব,

একদেশে সমাজতন্ত্র বিষয়ক স্তালিনীয় মতবাদ ইত্যাদি। এছাড়াও গ্রাম্‌শি, লুকাস, পোলানজাস, মিলিব্যাণ্ড, আলথুজার্স প্রমুখের রচনা ও অবদানের মধ্যে দিয়ে মার্কসীয় রাজনীতি চর্চার বিকাশসাধন হয়েছে।

ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা : রাজনীতি সম্পর্কিত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার প্রতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহল থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে এগুলি হল এই রকম :

প্রথমত, সমালোচকদের মতে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল দুর্বলতা এর নির্ধারণবাদী চরিত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। রাজনীতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় বা উপাদানের উপর প্রাধান্য প্রদান একে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদে (Economic determinism) পর্যবসিত করেছে। এই সীমাবদ্ধতা রাজনীতির সম্যক উপলব্ধির পথে অন্তরায় স্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক বিষয়াবলীর বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধির পথে অন্তরায়। কেননা, শ্রেণীগত অবস্থান গ্রহণের ফলে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণ ও অনুসরণকারীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সঠিক ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উপাদানের উপর প্রাধান্য প্রদানের কারণে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত আলোচনা 'এক কারণিক তত্ত্বের' (monocausal theory) জন্ম দেয় বলে অভিযোগ করা হয়। এই কারণেই বলা হয় এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত। সমালোচকদের মতে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে উপরিকাঠামোগত বিষয়গুলির যথোচিত গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়েছে।

চতুর্থত, এই দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নেই। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থানকে ব্যক্ত করে। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণযোগ্যতা শ্রেণীগতভাবে সীমাবদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক বিষয়াবলীর বস্তুনিষ্ঠ ও সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য গবেষণা ও বিশ্লেষণের সহায়ক নয়।

পঞ্চমত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে আর যুগোপযোগী নয়। সাবেকী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট দলসমূহের ও সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করে বলা হয় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিককালের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাবলীর সঠিক বিশ্লেষণ ও পথনির্দেশের সহায়ক নয়।

ষষ্ঠত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই রয়েছে নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই কারণে মার্কসবাদী মহলের মধ্যেই কর্তৃত্ববাদী ও স্বাধীনতাকামী, কমিউনিস্ট দলগুলির অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ও শাখা সংগঠনগুলির স্বাতন্ত্র্য, জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী কিংবা বিশুদ্ধ বিপ্লববাদী ও সংশোধনবাদী ইত্যাদি প্রবণতাসমূহের উদ্ভব ও টানাপোড়েন পরিলক্ষিত হয়েছে। এসবই এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি মাত্র।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রচলিত এইসব অভিযোগ ও সমালোচনাগুলি আপাতভাবে জোরাল এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এইসব সমালোচনাগুলির গভীরতা ও সারবত্তা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। রাজনৈতিক গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাবেকী ও আধুনিক পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গিগুলির একটি মূলগতভাবে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি—তা আজও অনস্বীকার্য।

এক গভীর অসন্তোষ। কিন্তু আচরণবাদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় এর জন্ম হলেও সাবেকী রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার মতন আচরণবাদোত্তর বিপ্লব স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী ও রক্ষণশীল নয়। বরং তা ভবিষ্যৎমুখী (future oriented)—কারণ তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এক নতুন গতিমুখে চালিত করতে চায়। এর প্রকৃতি ব্যাখ্যায় ইস্টন বলেছেন 'This new development is then a genuine revolution, not a reaction ; a becoming not a preservation ; a reform, not a counter-reformation.'[9]

বৈশিষ্ট্য : আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের মূল দাবী (battle cries) হল প্রাসঙ্গিকতা ও কাজ (relevance and action)। এর কয়েকটি স্পষ্টভাবে সনাক্তযোগ্য ধারণা বা মূল বক্তব্য (The tenets of its faith) রয়েছে। ইস্টন এগুলিকে "প্রাসঙ্গিকতার বিশ্বাস" (a credo of relevance) বলেছেন। এই বিশ্বাসগুলিই হল ইস্টনের মতে আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য। এগুলি হল[10] :

(ক) কৌশলের আগে বিষয়বস্তুকে স্থান দিতে হবে। যেখানে আচরণবাদের মূলকথা ছিল অস্পষ্ট হওয়ার থেকে ভ্রান্ত হওয়াও ভাল সেখানে তার জায়গায় আচরণবাদোত্তর বিপ্লবের মূলকথা হল অপ্রাসঙ্গিকভাবে নির্ভুল হওয়ার চেয়ে অস্পষ্ট হওয়াও শ্রেয়তর।

(খ) আচরণবাদ অভিজ্ঞতাবাদী রক্ষণশীলতার মতাদর্শকে গোপন করে থাকে। এটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তথ্য ও ঘটনার উপলব্ধিকে বাধা প্রদান করে।

(গ) আচরণবাদ অবশ্যই বাস্তবের সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলে কারণ তা রাজনীতির নির্মম বাস্তবতাকে গোপন করতে চায়। অন্যদিকে আচরণবাদোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হল নীরবতার বেড়াকে ভেঙ্গে ফেলা এবং সংকটকালে মানবজাতির প্রকৃত প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া।

(ঘ) মূল্যবোধের সার্বিক বর্জন নয়; মূল্যবোধের গঠনমূলক বিকাশ এবং সে বিষয়ে গবেষণা রাজনীতি চর্চার অপরিত্যাজ্য অংশ।

(ঙ) বুদ্ধিজীবি বা বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অবশ্য পালনীয় ভূমিকা হল সভ্যতার মানবিক মূল্যবোধগুলিকে রক্ষা করা।

(চ) জানার সাথে সাথেই কাজ করার দায়িত্ব এসে যায় এবং কাজ করার অর্থ হল সমাজ পুনর্গঠনে নিয়োজিত হওয়া। বিজ্ঞানী হিসাবে বুদ্ধিজীবির বিশেষ দায়বদ্ধতা হল জ্ঞানকে কাজে প্রয়োগ করা।

(ছ) বুদ্ধিজীবিদের এই দায়বদ্ধতার কারণেই বুদ্ধিজীবিদের সংগঠনগুলি যেমন পেশাদার সংঘ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বর্তমানকালের চলমান সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে পারে না। পেশাসমূহের রাজনীতিকীকরণ ইপ্সিত ও অপরিত্যাজ্য।

স্পষ্টতই আচরণবাদোত্তর বিপ্লব হল আচরণবাদী পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান

২ নম্বর ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

কলিকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য

প্রথম অধ্যায় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, পরিধি ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বা পদ্ধতি

প্রশ্ন ১। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়? *[C.U. '92]*

অথবা,

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। *[V.U. '89, '94, '95 ; B.U. '02]*

উত্তর। ব্লুণ্টশ্লির (Bluntschli) সংজ্ঞা অনুযায়ী, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা ও প্রকৃতি, এর বিভিন্ন রূপ ও বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করে।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্নারের মতে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সূচনা ও সমাপ্তি রাষ্ট্রকে নিয়ে"। সহজভাবে বললে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সেই শাস্ত্র যা রাষ্ট্র, সরকার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক আচার-আচরণ, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

প্রশ্ন ২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কী?

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিজ্ঞান। এর বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। তবুও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করতে পারি ঃ (১) রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব, (২) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, (৩) সরকার ও তার বিভিন্ন রূপ, (৪) রাজনৈতিক ক্ষমতা, (৫) রাজনৈতিক দল, (৬) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, (৭) ভোটাচরণ ও জনমত, (৮) তুলনামূলক রাজনীতি, (৯) আন্তর্জাতিক আইন, সংগঠন ও সম্পর্ক ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা যায়?

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় অনেক সময় বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচনা যেহেতু মানুষকে কেন্দ্র করে তাই লর্ড ব্রাইসের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আবহবিজ্ঞানের ন্যায় একটি অপরিণত বিজ্ঞান।

প্রশ্ন ৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলার পক্ষে যুক্তি দেখাও। *[C.U. '90]*

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় কারণ এখানে রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিভক্তিকরণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি করা যায়। দ্বিতীয়ত, ভৌতবিজ্ঞানের ন্যায় এখানেও পরিসংখ্যান, গাণিতিক তত্ত্ব এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা কী?

উত্তর। মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই হল রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিটি শ্রেণী যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে, রাজনীতির মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। তবে মার্কসবাদীদের মতে, রাজনীতির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হলেও, বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী,

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও রাজনীতি আলোচনা করে।

প্রশ্ন ৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান বলা হয় কোন্ অর্থে?

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা থাকে। এই আলোচনার ভিত্তিতে ভাবীকালের জন্য এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সরকারের চিত্র অঙ্কন করা যায় যা আমাদের উত্তরসূরিদের জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তুলতে পারে। এদিক থেকে বিচার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞান বলা চলে।

প্রশ্ন ৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলার পক্ষপাতী কারা?

উত্তর। এ্যারিস্টটল, বোদাঁ, মন্তেস্ক্যু, হবস, লর্ড ব্রাইস, ব্লুন্টস্‌লি, পোলক এবং আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলার পক্ষপাতী।

প্রশ্ন ৮। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলার বিপক্ষে কারা?

উত্তর। বাকল, কোঁত, মেটল্যাণ্ড প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলার পক্ষপাতী নন।

প্রশ্ন ৯। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতিগুলি কী কী? *[V.U. '88]*

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতি হল ঃ (১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি, (২) দার্শনিক পদ্ধতি, (৩) পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি, (৪) পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, (৫) তুলনামূলক পদ্ধতি, (৬) পরিসংখ্যামূলক পদ্ধতি, (৭) আচরণবাদী পদ্ধতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০। ঐতিহাসিক পদ্ধতির চারজন প্রবক্তার নাম লেখ। *[C.U. '89]*

উত্তর। ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রধান প্রবক্তারা হলেন ঃ দান্তে, ম্যাকিয়াভেলী, হবস, মন্তেস্ক্যু, হেগেল, মার্কস ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১১। রাষ্ট্রদর্শন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় রাষ্ট্রের ব্যবহারিক দিকটি বাদ দিয়ে নীতি ও আদর্শমূলক দিকটার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'কী হয়'—এর থেকে 'কী হওয়া উচিত' এই প্রশ্নই রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় গুরুত্ব পায়। এককথায় রাষ্ট্রের দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণই হল রাষ্ট্রদর্শনের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ১২। দার্শনিক পদ্ধতির স্বরূপ ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর। *[C.U. '91]*

উত্তর। এই পদ্ধতিতে কোন একটি সাধারণ অনুমানকে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নিয়ে অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। এছাড়া এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রসম্পর্কে একটা আদর্শ মানদণ্ডের নিরিখে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হল এই যে, **প্রথমত,** এই পদ্ধতিতে বাস্তবকে উপেক্ষা করা হয় এবং **দ্বিতীয়ত,** আদর্শের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন ১৩। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মূল প্রতিবাদ্য বিষয় কী?

উত্তর। ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রবক্তাদের মতে, কোন কিছুকে বুঝতে হলে তার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস জানা দরকার। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানের কর্মসূচী নির্ধারণ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা সম্ভব। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট বলেছেন, ইতিহাস

কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই করে না, ভবিষ্যতের নির্দেশক হিসাবে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ১৪। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যাবলী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। লর্ড ব্রাইস, লাওয়েল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ এই পদ্ধতির বিশেষ সমর্থক।

প্রশ্ন ১৫। আইনমূলক পদ্ধতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। আইনমূলক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্থা হিসাবে না দেখে কেবলমাত্র একটি আইনগত সংস্থা হিসাবে দেখা হয়। এই পদ্ধতি রাজনৈতিক জীবনের সর্বপ্রকার সম্পর্ককে আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিচার বিশ্লেষণ করে।

প্রশ্ন ১৬। আইনমূলক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

উত্তর। আইনগত পদ্ধতি সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট, কারণ এই পদ্ধতি অনুসারে আইনগত গণ্ডীর বাইরে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করা হয় না। বাস্তবিকপক্ষে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়ন কেবলমাত্র আইনগত দিক থেকে করা যায় না।

প্রশ্ন ১৭। তুলনামূলক পদ্ধতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। এই পদ্ধতির প্রবক্তা কারা?

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাচীন আলোচনা পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল তুলনামূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একদিকে অতীতের সঙ্গে বর্তমান এবং অন্যদিকে একদেশের সঙ্গে অন্য দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতির প্রধান প্রবক্তারা হলেন এ্যারিস্টটল, বোদাঁ, মন্তেস্কু, লর্ড ব্রাইস প্রমুখেরা।

প্রশ্ন ১৯। সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতি কী?

উত্তর। সমাজতত্ত্বমূলক পদ্ধতি রাষ্ট্রকে সমাজদেহ হিসাবে কল্পনা করে। সামাজিক পরিবেশ ও উপকরণের প্রভাবে কিভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটছে তা এই পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়। কার্ল মার্কস, কোঁত, স্পেনসার প্রমুখেরা সমাজতত্ত্বের পটভূমিকায় রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রশ্ন ২০। জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি কী?

উত্তর। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নীটসে, ট্রিট্‌সকে প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ এই পদ্ধতির সমর্থক। এই পদ্ধতি অনুসারে সমাজজীবনের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর পড়ে।

প্রশ্ন ২১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোনোটিই এককভাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। কারণ কোনো পদ্ধতিই এককভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল সমস্যা আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে তুলনামূলক বিচারে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, তুলনামূলক পদ্ধতি, পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ২২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর নাম লেখ।

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রধানত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় : (১) সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী, (২) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং (৩) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রশ্ন ২৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনে সাবেকী বা ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গী কাকে বলে?

[C.U. '84, T.U. '88, '91, B.U. 2001]

উত্তর। এ্যালান বলের মতে, সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী হল সেই দৃষ্টিভঙ্গী যা বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুসৃত হত। এ্যালান বল দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীকে সাবেকী বা ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত করেন। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী মূলত বর্ণনাত্মক, অবরোহী, প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক নীতিমানবাচক এবং আত্মদর্শনমূলক (introspective)।

প্রশ্ন ২৪। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। *[C.U. '92]*

উত্তর। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী হল আদর্শমুখী, কল্পনানির্ভর। এই দৃষ্টিভঙ্গী নৈতিকতা ও চিরায়ত মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেয়। এ ছাড়া এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন ২৫। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর মুখ্য প্রবক্তাদের নাম কর। *[C.U. '92]*

উত্তর। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর মুখ্য প্রবক্তাদের মধ্যে প্লেটো, এ্যারিস্টটল, ম্যাকিয়াভেলি, বোদাঁ, মন্তেস্ক্যু, হেনরী মেইন, হবস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন ২৬। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর দুটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

উত্তর। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা হিসাবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক আলোচনাকে মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্তঃসমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক আলোচনায় উৎসাহ দেখান হয় না।

প্রশ্ন ২৭। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে আচরণবাদীদের দুটি প্রধান সমালোচনা উল্লেখ কর। *[C.U. '93]*

উত্তর। সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বলে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ ও মানুষের আচার-আচরণের বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল থাকে, যেমন রাজনৈতিক দল, জনমত, স্বার্থ-গোষ্ঠী ইত্যাদি, এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সেগুলি উপেক্ষিত।

প্রশ্ন ২৮। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন্ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীগুলি পড়ে?

[T.U. '89, '90]

উত্তর। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীগুলি হল : (১) আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, (২) ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভী, (৩) কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী, (৪) গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২৯। কয়েকজন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তার নাম কর।

উত্তর। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন—আর্থার বেন্টলী, গ্রাহাম ওয়ালেস, ডেভিড ইস্টন, চার্লস মেরিয়াম, মর্টন ক্যাপলান, রবার্ট ডাল ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৩০। আচরণবাদী পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গী কাকে বলে?

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনার জন্য অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব গঠন এবং তত্ত্ব ও গবেষণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার

প্রয়াসই হল আচরণবাদ। আর্নল্ড ব্রেখট-এর মতে, আচরণবাদ হল রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতাবাদী ও চিরস্থায়ী তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। রবার্ট ডাল-এর মতে, আচরণবাদ আধুনিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞানগুলিকে প্রচলিত গবেষণাপ্রণালী ব্যবহার করে রাজনৈতিক জীবনের আচার-আচরণকে ব্যাখ্যা করে এবং আন্তঃসামাজিক বিজ্ঞানের সহযোগিতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে চেষ্টা করে।

প্রশ্ন ৩১। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ৪ জন প্রবক্তার নাম কর।

[C.U. '83, '84 ; T.U. '88]

উত্তর। (ক) আর্থার বেন্টলী, (খ) গ্রাহাম ওয়ালেস, (গ) লাসওয়েল, (ঘ) চার্লস মেরিয়াম।

প্রশ্ন ৩২। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দু'টি সমালোচনা লেখ।

উত্তর। (ক) আচরণবাদে সংখ্যায়ন ও পরিমাপের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(খ) আচরণবাদ একটি চরম রক্ষণশীল মতবাদ।

প্রশ্ন ৩৩। ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গীর দুজন প্রবক্তার নাম কর।

উত্তর। (ক) ডেভিড ইস্টন, (খ) গ্যাব্রিয়েল অ্যালমণ্ড।

প্রশ্ন ৩৪। কাঠামো-কার্যগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী 'কাঠামো' ও 'কার্য' বলতে কী বোঝায়?

[C.U. '91]

উত্তর। কাঠামো বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সেইসব ক্রিয়াকলাপকে বোঝায় যেগুলি পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং যেগুলির পারস্পরিক সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপকে 'কার্য' বা 'ভূমিকা' বলে।

প্রশ্ন ৩৪(ক)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি কী? *[B.U. 2003]*

উত্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমাজ হল এমন একটি অবিভাজ্য সামগ্রিক সত্তা, যার মৌল কাঠামোটি অর্থনৈতিক, অর্থাৎ যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মার্কসাবাদীদের মতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই হল রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিটি শ্রেণী যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে, রাজনীতির মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। রাজনীতি গঠনের পিছনে আবার অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকাই থাকে সবচেয়ে বেশি। তাই লেনিন রাজনীতিকে 'অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ' (concentrated expression of economics) বলেছেন।

প্রশ্ন ৩৫। আচরণবাদী ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মূল পার্থক্য হল এই যে, আচরণবাদীরা যেখানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার স্থিতাবস্থায় আস্থাশীল, মার্কসবাদরা সেখানে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তনে বিশ্বাসী। **দ্বিতীয়ত,** মার্কসবাদীরা যেভাবে সমাজব্যবস্থার মৌল চরিত্র নির্ধারণে অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, আচরণবাদীরা তা করেন না। **তৃতীয়ত,** আচরণবাদীরা যে মূল্য-নিরপেক্ষ (value-free) রাজনীতি আলোচনার কথা বলেন, মার্কর্সবাদীরা তাতে আস্থাশীল নন।

প্রশ্ন ৩৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে গার্নারের মত উল্লেখ কর।

উত্তর। গার্নারের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু এবং শেষ রাষ্ট্রকে নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করবে।

প্রশ্ন ৩৭। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে গেটেলের মত উল্লেখ কর।

উত্তর। গেটেলের মত অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র রাষ্ট্রের তত্ত্বগত দিক আলোচনা করে না। এর সংগঠনগত রূপ অর্থাৎ সরকারের আলোচনাও করে।

প্রশ্ন ৩৮। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (UNESCO, ১৯৪৮) প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কী?

উত্তর। UNESCO-র প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল ঃ

(ক) রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস, (খ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সংবিধান, (গ) সরকার ও তার পরিচালন ব্যবস্থা, (ঘ) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও